

তাওহীদ আল-হাকিমিয়াহ

ইবনে মালিক আল-আছারী



AHLUL HAQQ
publications

তাওহীদ আল-হাকিমিয়াহ

ইবনে মালিক আল-আছারী

১৪৪৭ হিজরি

অনুবাদ ও প্রকাশনায়:



AHLUL HAQQ
publications

আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, ‘হাকিমিয়াহ শব্দটি কুরআন থেকে এসেছে, যেখানে আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

“বিধান [হুকুম/আইন] দেয়ার অধিকার শুধু আল্লাহরই।” [ইউসুফ:৪০]

“তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে [হুকুমে, আইন প্রণয়ণে] শরীক করেন না।” [কাহফ:২৬]

“আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না তারাই কাফির।” [মা’ইদা:৪৪]

আল্লাহ ﷻর নাম ও গুণাবলী থেকেই এ বিষয়টি উদ্ভূত হয়েছে, যেমন আল-হাকাম, আল-‘আদল, আল-মুতাকাবিবর, আল-মালিক।

তাওহীদুল-হাকিমিয়াহ অস্বীকার করা আসলে ‘ইলহাদ’।

এটি তখন ঘটে যখন কেউ আল্লাহর নামগুলোর কোনো একটিরও অর্থ অস্বীকার করে। কেউ শুধু নাম অস্বীকার করতে পারে, আবার কেউ নাম ও গুণ উভয়ই অস্বীকার করতে পারে।

এটি ইসলামের বিভ্রান্ত ফিরকাগুলোর একটি ফিরকার বৈশিষ্ট্য, যেমন জাহমিয়াহ।

আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক; আর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন কর; তাদের কৃতকর্মের ফল অচিরেই তাদেরকে দেওয়া হবে। [আরাফ:১৮০]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, “তারা শিরক করেছে” কিছু লোক যুক্তি দেখায় এভাবে: “আমরা আল-হাকাম নামকে মানি, কিন্তু হাকিমিয়াহ মানি না”—যেমন আজকের যুগে কিছু লোক বলে থাকে। অথচ এই যুক্তি ঠিক একই রকম, যেমন কেউ বলে: “আমরা আল্লাহকে মানি, কিন্তু উলুহিয়াহ মানি না।” এটি একেবারেই অগ্রহণযোগ্য; কেননা নাম যেমন মানতে হবে, তেমনি সেই নামের অন্তর্নিহিত অর্থ ও প্রভাবও মানতে হবে।

আর যারা তাওহীদুল-হাকিমিয়াহকে মূলনীতি হিসেবে অস্বীকার করে, তারা আসলেই বড় শিরক ও বড় কুফরের কাছাকাছি অবস্থানে চলে যায়। কারণ, যদি তাওহীদ (শুধুমাত্র আল্লাহকে একত্ব স্বীকার করা) বিদ‘আহ হয়, তবে এর মানে দাঁড়ায়—হাকিমিয়াহর ক্ষেত্রে শিরক করা জায়েয হয়ে যায়। প্রমাণ হলো—

“তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে [হুকুমে, আইন প্রণয়ণে] শরীক করেন না।”[কাহফ:২৬]

এই আয়াতে আল্লাহ তাঁর আইনপ্রণয়ন ও বিধান দেওয়ার ক্ষমতা (হাকিমিয়াহ)-এর সঙ্গে সরাসরি বড় শিরকের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন [অর্থাৎ এতে শিরক করা মানেই আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার করা]। তাওহীদের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো বিষয় কখনোই বিদ‘আহ হতে পারে না, আর একে বিদ‘আহ মনে করাও উচিত নয়। যারা “তাওহীদুল-হাকিমিয়াহ” শব্দটিকে অস্বীকার করে, তারা খুব সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী; কারণ তারা বোঝে না যে, যেমন উলুহিয়াহ একটি পরিভাষা, যার মাধ্যমে একটি মূলনীতিকে ভালোভাবে বোঝানো হয়, তেমনি হাকিমিয়াহও কেবল একটি মাধ্যম—একটি পরিভাষা, যার দ্বারা একটি নীতিকে স্পষ্ট করা হয়।

যখন আমরা কোনো বিশেষ পরিভাষা ব্যবহার করি, তখন এর অবশ্যই একটি স্পষ্ট অর্থ থাকতে হবে। আর যদি কেউ আমাদের কাছে এর ব্যাখ্যা জানতে চায়, তবে আমরা যে পরিভাষাই ব্যবহার করি না কেন, তার ইসলামী ব্যাখ্যা দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। যদি এমনটা না হয়, তবে আমাদের এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করা ভিত্তিহীন হয়ে যাবে। আমরা যখন হাকিমিয়াহ বলি, তখন এর দ্বারা আমরা বোঝাই— আল্লাহর সেই হুকুমকে রক্ষা করা, যা তিনি আমাদের নিকট আমানত হিসেবে দিয়েছেন, তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে।

সে হুকুম হলো—আইন প্রণয়ন করা, বিচার করা এবং সেই বিচার কার্যকর করা। এর ভিত্তি নিম্নলিখিত প্রমাণসমূহে আছে—

“তিনি(আল্লাহ) তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন”[শূরা:১৩]

“নাকি তাদের এমন কতগুলো শরীক রয়েছে, যারা এদের জন্য দীন থেকে শরীআত প্রবর্তন করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি?”[শূরা:২১]

“তারপর আমরা আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দীনের বিশেষ বিধানের উপর; কাজেই আপনি তার অনুসরণ করুন। আর যারা জানে না তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না”[জাছিয়াহ:১৮]

খেয়াল করুন, এখানে আল্লাহ নিজেই আয়াতে “শরীয়াহ” শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সুতরাং শুরু থেকেই আল্লাহ প্রমাণ করেছেন যে, তাঁর সঙ্গে শরীয়াহর সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। আর এ শরীয়াহই হলো সেই বন্ধন বা সংযোগ, যা খালিক

(শ্রেষ্টা) ও মাখলুকের (সৃষ্টি) মাঝে রয়েছে, এবং ঠিক এটিই হাকিমিয়াহকে প্রতিনিধিত্ব করে।

অসংখ্য আয়াত আছে যা উল্লেখ করে যে, আল্লাহর হুকুমই (আইনপ্রণয়ন) একমাত্র হুকুম, এবং অন্য কোনো হুকুম গ্রহণযোগ্য নয়। হাকিমিয়াহ শব্দটি বোঝায় সেই ক্ষমতাকে যা আইন প্রণয়নের নিয়ম নির্ধারণ বা নিয়ম বানানোর ক্ষমতা ধারণ করে। এটি আল্লাহর নাম আল-হাকাম-এ বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়, যা আল-হাকিম থেকে আলাদা। আল-হাকাম হলো সেই ক্ষমতা যা আইন প্রণয়ন এবং বিধি-নিষেধ তৈরির অধিকার দেয়, যেকোনো ব্যক্তির জন্য আল্লাহ ইচ্ছা করলে প্রয়োগযোগ্য।

অতএব, যখন কোনো আল-হাকিম (মানব) তার সীমা অতিক্রম করে এবং আইন তৈরির চেষ্টা করে, তখন সে আল-হাকামের দিকের সীমা অতিক্রম করেছে। যদিও সে কিছু বলেনি, তবুও কাজটি করেছে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর মতানুযায়ী, এটি বড় শিরক হিসেবে গণ্য, কারণ এটি আল্লাহর একমাত্র এবং অনন্য নামের প্রতি স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ।

এই নামগুলোর অর্থ হলো—আমরা কাউকেও আল্লাহর এই উপাধি বা তাঁর বান্দাদের ওপর কোনো ক্ষমতায় অংশীদার হতে দিই না। এটি উলুহিয়াহর তাওহীদের একটি প্রতিফলন, যা বলে: “তিনি আল্লাহ।”

নাম ও গুণাবলীর তাওহীদের সাথে এর প্রতিফলন সম্পর্ক হলো—যেমন আল্লাহ আল-হাকিম, তাই আমরা পাই তাওহীদুল-হাকিমিয়াহ। তিনি আল-‘আদল, তাই আমরা পাই তাওহীদুল-‘আদলিয়াহ (সর্বাধিক ন্যায্যতার তাওহীদ)। তিনি আল-

মালিক, তাই আমরা বলি তাওহীদুল-মুলকিয়াহ (আল্লাহর আইন প্রণীত শাসনের তাওহীদ)। এগুলো সবই আমাদের দায়িত্ব পালনের জন্য এই তাওহীদকে বোঝার সাথে সম্পর্কিত। যেভাবেই আমরা বলি, সবই আল্লাহর আইন প্রণয়নের ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত। ঠিক একইভাবে, তাওহীদুল-উলুহিয়াহ কখনো তাওহীদুল-ইবাদাহ নামে পরিচিত, কখনো ইলাহিয়াহ, এবং অন্য কোনো সময় ‘উবুদিয়াহ নামে পরিচিত।

শরীয়াহর পরিভাষায় বোঝা যায় যে, তাওহীদের বিপরীত হলো শিরক। সুতরাং, তাওহীদের বিরুদ্ধে যাওয়া বা সেটি লঙ্ঘন করা ব্যক্তিকে মুশরিক (শিরককারী) বানায়। একইভাবে, আনুগত্য করা ও ইবাদত করাও তাওহীদের অংশ। তাই, যে কেউ হালাল ও হারাম বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করবে বা সে অনুযায়ী কাজ করবে, সে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আনুগত্য করার দোষে দোষী হবে, যা আবার শিরক।

এভাবে আমরা নিচের আয়াতটি বুঝে থাকি,

“আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক।”

[আন’আম:১২১]

আল-হাফিজ ইবনে কাসীর (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন: “যদি তুমি আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর শরীয়াহকে ছেড়ে দাও অন্য কারো কথায়, সেটাই প্রকৃত শিরক।”

যেমন আল্লাহ বলেন— “তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগিদেরকে তাদের রবরূপে গ্রহণ করেছে।”

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে ‘আদী ইবনে হাতিম (রাঃ)-এর ঘটনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এ আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ-ﷺকে বলেছিলেন, “হে আল্লাহর রাসূল, তারা তো তাদের উপাসনা করেনি।” তিনিﷺ উত্তর দিলেন, “বরং তারা অবশ্যই করেছে। তারা তাদের জন্য হারামকে হালাল করেছে এবং হালালকে হারাম করেছে, আর তারা তাদের আনুগত্য করেছে। এভাবেই তারা তাদের উপাসনা করেছে।”

[তাফসীরুল কুরআনুল আজীম, খণ্ড ২, এ আয়াতের তাফসীরের অধীনে]

শাইখ মুহাম্মদ আল-আমীন আশ-শানকীতী (রহঃ) এই আয়াত উল্লেখ করার সময় এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, “এভাবে পরিকার হয়ে গেল যে, তারা তাদের আনুগত্য করার মাধ্যমে মুশরিক হয়েছে। আর এই অংশীদার বানানো হলো আনুগত্যের (তা‘আ) মাধ্যমে। আল্লাহ যা প্রণয়ন করেছেন তার বিপরীতে যে আইন প্রণয়ন করা হয় এবং সেটাকে অনুসরণ করা হয়—আসলে সেটিই শয়তানের ইবাদত।”

[আদওয়াউল বায়ান, তাফসীরুল কুরআন বিল কুরআন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬৫]

এই আয়াতটি, সাথে সূরাতুত-তাওবার ৩১ নম্বর আয়াত, উপরে বর্ণিত আনুগত্যের শিরককে পরিপূর্ণভাবে স্পষ্ট করে তুলে ধরে। এই আয়াতকে এত গুরুত্বপূর্ণ করার কারণ হলো—আনুগত্য ও ঈমান একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এ কারণেই আল্লাহ শুধু তাদের ঈমানকেই অস্বীকার করেননি যারা আইন প্রণয়ন করে, বরং যারা স্বেচ্ছায় সেই আইনপ্রণেতাদের অনুসরণ করে বড় শিরকে লিপ্ত হয়, তাদের ঈমানকেও অস্বীকার করেছেন।

ইমাম আল-কাসতালানী (রহ.) এ আয়াতের নাজিল হওয়ার কিছু কারণ পরিষ্কার করেছেন। তিনি বলেন: “বিষয়টা আসলে শুধু এতটুকু নয় যে তুমি কী বিশ্বাস করলে। আসল ব্যাপার হলো, তোমার অন্তরে কী আছে। তুমি আয়াতগুলোতে বিশ্বাস করো কি না—কিন্তু তা যদি বাস্তবে প্রয়োগ ও বিধান মান্য করার মাধ্যমে প্রকাশ না পায়, তাহলে সে বিশ্বাস যথেষ্ট নয়। প্রকৃত ঈমানের নিদর্শন হলো অনুসরণ ও আনুগত্য করা। অন্যথায় সেটি আনুগত্য বা সমর্পণ হিসেবে গণ্য হয় না।”

[ইরশাদ আস-সারী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮২]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) ব্যাখ্যা করেছেন কেন আইন প্রণেতাদের আনুগত্য করাও বৈধ নয়, আইন প্রণয়নের দিকে যাওয়াতো দূরের কথা। তিনি বলেন, “এটা জানা বিষয় যে, ঈমান হলো গ্রহণ করা। ইকরার (মূলনীতির স্বীকৃতি) বলতে বোঝায়: তুমি কোনো আদেশকে অন্তরে গ্রহণ করো; এটা অন্তরের কাজ, এবং তার প্রকাশই হচ্ছে আনুগত্য। অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে বিষয় এনেছেন, তাতে বিশ্বাস করা এবং তিনি যা আদেশ দিয়েছেন তা অনুসরণ করা। মানুষ যখন আল্লাহকে গ্রহণ করবে, তখন তাদের উচিত সর্বোচ্চ চেষ্টা করা—অর্থাৎ আল্লাহকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা এবং তাঁর ইবাদত করা। আর কুফর হলো অবিশ্বাস, আমল না করা ও অনুসরণ না করা। এতে থাকতে পারে অস্বীকার, ঔদ্ধত্য, অস্বীকৃতি বা বিমুখ হওয়া। “অন্তরে যদি ঈমান না আসে—বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই হোক কিংবা আনুগত্য ও অনুসরণের ক্ষেত্রেই হোক—তাহলে সে কাফির।”

[আল-ইমান আল-আওসাত, পৃ. ১৮০-১৮১]

শাইখ ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়া (রহ.) বলেন: “ঈমান কেবল অন্তরের বিশ্বাসের নাম নয়। বরং সেই বিশ্বাসের সঙ্গে অবশ্যই অনুসরণ ও আনুগত্য থাকা জরুরি। হিদায়াহ (সঠিক পথপ্রাপ্তি) কেবল সত্যকে জানার নাম নয়; বরং সত্যকে জানা এবং তাকে অনুসরণ করার নাম। হিদায়াহ ও তাসদীক হলো—কোনো বিষয়কে জানা এবং তা অনুযায়ী আমল করা। যদিও কিছু মানুষ জ্ঞানকেই হিদায়াহ বলে থাকে, কিন্তু জ্ঞান একা প্রকৃত হিদায়াহ নয়; এটি এমন হিদায়াহ নয় যা কাউকে সুপথপ্রাপ্ত বানায়। একইভাবে কোনো কিছুতে বিশ্বাস স্থাপন করা সেই পূর্ণ বিশ্বাস নয় যা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।”

[কিতাবুস সালাহ, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ২০]

“অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান এনে থাক। এ পন্থায় উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।” [নিসা:৫৯]

আল-আল্লামাহ ইবন কাসীর (রহ.) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন: “এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ যে, আমরা যে সব বিষয়ে মতবিরোধ করি—তা মূলনীতির হোক বা শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত হোক—সবকিছুই ফিরিয়ে নিতে হবে আল্লাহর কাছে, তাঁর কিতাবের দিকে এবং সুন্নাহর দিকে। যেমন আল্লাহ অন্য আয়াতে

বলেছেন: ‘তোমরা যদি কোনো বিষয়ে মতভেদ করো, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।’

কুরআন ও সুন্নাহ যে বিষয়ে বিধান দিয়েছে এবং সাক্ষ্য দিয়েছে, সেটাই হক (সত্য)। আর হকের পর গোমরাহি ছাড়া আর কী থাকতে পারে। এরপর আয়াতে এসেছে: ‘যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখো।’

অতএব, যদি তোমরা আল্লাহতে ঈমান রাখো, তবে সব অজ্ঞতা, বিবাদ কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরিয়ে দাও। এটি প্রমাণ করে যে, যারা তাদের বিরোধ কুরআন ও সুন্নাহর বিধান অনুযায়ী মীমাংসা করে না, তারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমানদার নয়।”

[তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫১৮]

ইমাম ইবন জারীর আত-তাবারী (রহ.) বলেন: “আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম গোপন করে—যেটি তিনি তাঁর কিতাবে নাযিল করেছেন এবং বান্দাদের মধ্যে বিধান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন—সে যদি তা লুকিয়ে ফেলে এবং অন্য কোনো বিধান দ্বারা বিচার করে, যেমন ইহুদিরা বিবাহিত ব্যভিচারকারীদের ব্যাপারে করত: তারা প্রকৃত হুকুম—রজম (প্রস্তর নিক্ষেপ)—গোপন করে কেবল বেত্রাঘাত করত এবং তাদের মুখ কালো করে দিত। আবার তারা হত্যার ক্ষেত্রে কারো জন্য পূর্ণ রক্তমূল্য ধার্য করত, কারো জন্য অর্ধেক রক্তমূল্য, আর অভিজাতদের ক্ষেত্রে কিসাস (সমান প্রতিশোধ) কার্যকর করত, অথচ সাধারণদের ক্ষেত্রে কেবল রক্তমূল্যে সীমাবদ্ধ রাখত। অথচ আল্লাহ তা‘আলা তাওরাতে সবার জন্য সমান বিধান নির্ধারণ করেছিলেন। ... এমন

লোকেরাই কাফির। তারা সেই সত্যকে গোপন করেছে, যা প্রকাশ করা এবং পরিষ্কার করা তাদের দায়িত্ব ছিল। তারা তা মানুষের কাছ থেকে আড়াল করেছে এবং অন্য কিছু দেখিয়েছে। আর তারা সেই পরিবর্তিত বিধান অনুযায়ী বিচার করেছে, কারণ তারা এর বিনিময়ে ঘুষ নিয়েছিল।”

[তাফসীর আত-তাবারী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫৯২]

ইবনে হাযম আল-আন্দালুসী বলেন, “যে ব্যক্তি ইসলামী শরীয়াতে যেসব বিষয়ে নাজিল কোনো বিধান (আয়াত বা হাদীস) নেই, এমন বিষয়ে যদি সে ইঞ্জিল দ্বারা বিচার করে, তবে সে কাফির ও মুশরিক; ইসলামের বাইরে।”

[ইহকাম আল-আহকাম ফি উসুল আল-আহকাম, ৫/১৫৩]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন: “যখনই একজন ব্যক্তি কোনো ইজমা অনুযায়ী হারাম বিষয়কে হালাল করে বা কোনো ইজমা অনুযায়ী হালাল বিষয়কে হারাম করে, অথবা যে কোনো বিষয়ের শরীয়তের বিধানকে বদলে দেয় যা সব উলামা সর্বসম্মতভাবে স্বীকার করেছেন, সে ফিকহের উলামাদের সম্মতিতে কাফির।”

[আল-ফাতাওয়া, খণ্ড ৩, পৃ. ২৬৭]

ইমাম ইবনু কাইয়িম আল-জাওযিয়া (রহ.) বলেন: “(ত্বগুত হলো) যে কেউ তার সীমা অতিক্রম করে— সে উপাসিত হোক, অনুসরণযোগ্য হোক বা আনুগত্যযোগ্য হোক। যেকোনো জনগোষ্ঠীর ত্বগুত হলো সেই ব্যক্তি যাকে তারা

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাদে বিচারক হিসাবে গ্রহণ করে, অথবা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার ইবাদত করে, অথবা এমনভাবে তাকে অনুসরণ করে যা আল্লাহকে বিবেচনা করে না, অথবা এমন বিষয়ে তার আনুগত্য করে যেখানে তারা জানে না এটি আল্লাহর আনুগত্যের অন্তর্গত কি না। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন, তা দ্বারা বিচার করে না বা তার দিকে ফিরে না, সে অবশ্যই এক মিথ্যা উপাস্যের অনুসরণ করছে।”

[ই’লাম আল-মুওয়াক্কিই’ন, খণ্ড ১, পৃ. ৫০]

ইবন কাসীর (রহ.) বলেন: “সুতরাং যে ব্যক্তি স্পষ্ট শরীয়ত ত্যাগ করে—যেটি নাযিল হয়েছে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ, নবীদের সীলমোহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর—এবং তার পরিবর্তে কুফরির বাতিল ও রহিতকৃত আইনগুলোর দিকে হুকুমের জন্য ফিরে যায়, তাহলে সে কুফরি করেছে। তাহলে তার ক্ষেত্রে কী যে ‘ইয়াসিক’ (তাতারদের আইন—যা শরীয়তের বিধান ও মানুষের তৈরি বিধানের মিশ্রণ) গ্রহণ করে এবং শরীয়তের উপর সেটিকে অগ্রাধিকার দেয়?! যে ব্যক্তি এমনটি করে, সে মুসলিমদের ইজমা অনুযায়ী কাফির।”

[আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড ১৩, পৃ. ১১৮–১১৯]

শাইখ হাম্মাদ ইবন ‘আতীক আন-নাজদী (রহ.) বলেছেন: “চতুর্দশ বিষয়টি হলো আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল ছাড়া অন্য কারও কাছে বিচার প্রার্থনা করা।”

এরপর তিনি ইবন কাসীরের সেই ফাতওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, যা সূরা মায়িদার আয়াত “তারা কি জাহিলিয়াহর বিচার কামনা করে?” যা আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করেছি।

তারপর তিনি বলেন, “এমনটি হয়েছে সাধারণ বেদুঈন ও তাদের মতো লোকদের ক্ষেত্রে, যারা তাদের পিতৃপুরুষের রীতিনীতি এবং তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত অভিযুক্ত প্রথাসমূহের কাছে বিচার প্রার্থনা করে, যাকে তারা ‘রিফাওয়ার শারী‘আহ’ নামে অভিহিত করে। তারা এটিকে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্যাহর আগে স্থান দেয়। অতএব, যে তা করে সে কাফির এবং তার সাথে যুদ্ধ করা ওয়াজিব যতক্ষণ না সে আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমে ফিরে আসে।

[মাজমু‘আতুত তাওহীদ, পৃ. ৪১২]

অনুবাদক: "তাওহীদ আল-হাকিমিয়াহ" হলো তাওহীদ আল-উলুহিয়াহ, তাওহিদ আর-রুবুবিয়াহ, তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাতেরই নির্যাস; আলাদা এমন কোনো ক্যাটাগরি না যা নাস দ্বারা প্রমাণিত না। আর তাওহীদের এমন ৩টি শ্রেণীর নির্ধারণ নবী ﷺ বা কোনো সাহাবি **رضي الله عنه** করে যাননি। এইসব শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে পরবর্তী ইমামদের মাধ্যমে। কেউ কেউ এমন শ্রেণীবিভাগের বিরোধিতাও করেছে আবার কেউ কেউ ২টি শ্রেণীর উল্লেখ করেছে। মূল লক্ষ্য ছিল তাওহীদ বুঝতে পারা। তাওহীদের শ্রেণী সম্পর্কে শায়খ সুলাইমান ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাবকে(রহ.) প্রশ্ন

করা হয়েছিল, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি পূর্ণাঙ্গ তাওহীদ পাচ্ছে, ততক্ষণ একে দুই শ্রেণিতে ভাগ করছো না তিন শ্রেণিতে ভাগ করছো তা গুরুত্বপূর্ণ না।'

কিন্তু মাদখালি-মুরজিয়ারা তাওহীদ আল-হাকিমিয়াহ'র নাম শুনলে পাগলা কুকুরের মতো ছটফট শুরু করে, কারণটা কারোরই অজানা নয়। আর যেমনটা আমরা জানি, তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো দুনিয়ার সকলকে মুবতাদি আখ্যা দিতে থাকা যতক্ষণ না নিজেদের মতাদর্শের গুটিকয়েক ভ্রষ্ট পথচারী অবশিষ্ট থাকে, এক্ষেত্রেও তারা তাদের বিষাক্ত জিহবা দ্বারা মুওয়াহহিদ উলামাদের মুবতাদি খারিজি বলে আক্রমণ করেছে।

অতএব, আমি বলি, তাওহীদের আলোচনা ৩টি শ্রেণীতেই করা উচিত; কিন্তু যখন মানুষের মধ্যে অজ্ঞতা চেপে বসবে, বুঝতে অসুবিধা হবে, শুবহাতে ভুগবে তখন মানুষের প্রয়োজন অনুসারে একে যতগুলো শ্রেণীতে ভাগ করা জরুরি হয়ে পরে ততগুলো ভাগই করা উচিত।